প্রাকৃতিক কৃষি কেন জরুরি

মেহেদী হাসান সুমন

আমাদের চারপাশের অধিকাংশ মানুষই মনে করেন, পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্যের যোগান দিতে আধুনিক কৃষি এক বিরাট আশীর্বাদ। উচ্চফলনশীল জাত, অধিক উৎপাদন এবং সকল কিছুরই বারমাস ধরে আবাদের সুযোগ না থাকলে দিকে দিকে হয়তো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতো। কিন্তু আপনি জানলে অবাক হবেন যে, পৃথিবীতে প্রতিদিন যত খাবারের চাহিদা রয়েছে, এই প্রক্রিয়ায় তার শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ খাবার তৈরি হয়। কিন্তু এই উৎপাদন পদ্ধতি আজকের পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ দূষণের জন্য দায়ী। 'আধুনিক' এই কৃষি ব্যবস্থার পেছনে রয়েছে বিরাট বিরাট কর্পোরেশন, বৃহৎ পুঁজি। প্রচারযন্ত্র আর দেশে দেশে নীতিমালা তৈরির পুরো ক্ষমতা এই কর্পোরেশনগুলোর হাতে থাকায়, অধিকাংশ মানুষই মেনে নিয়েছেন যে, তার খাদ্য তৈরি করে এই কর্পোরেশনগুলো। আমাদের মনে রাখা দরকার, পুঁজি কখনও খাবার সৃষ্টি করে না। সৃষ্টি করে টাকা। এই অনুধাবন থেকেই আমাদের দেশে কৃষির সার্বিক পরিস্থিতি ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে এই ধারাবাহিক লেখাটির অবতারণা।

২০১৪ সালে বাংলা নিউজ২৪.কমে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল খুব উদ্বেগজনক। 'হরমোন-রাইপেন-ফরমালিনের চক্রে মধুপুরের আনারস।'[১] 'চক্র' শব্দটা এখানে এক ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু যতদূর বুঝি তাতে আনারস চাষ সম্পূর্ণতই নির্দোষ একটি কৃষি কর্মকাণ্ড। আমরা যে আধুনিক চাষ পদ্ধতির কাছে 'নতজানু' হয়ে আছি, সেই উৎপাদন পদ্ধতিটিই এমন যে তা একজন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছে অপরাধমূলক কাজ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। কথাটির গুরুত্ব এদেশের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত তথ্যসেবা, কৃষিতথ্য সার্ভিসের[২] ওয়েবসাইটে ঢুকলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে, যেখানে হরমোন প্রয়োগে দ্রুততম সময়ে আনারস বাজারজাত করার চাষ পদ্ধতিকে এদেশের উদ্যানতত্ত্ববিদদের একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু এই বিশেষজ্ঞদের লেখাগুলোকে আরেকটু গভীরভাবে পড়লে আপনি দেখতে পাবেন, সেগুলো শুধুমাত্র অধিক উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে টাকার অঙ্কে লাভের হিসাবে ভর্তি এবং ক্ষতির কথা আশঙ্কাজনকভাবে অনুপস্থিত। যেন কৃষকের মূল কাজ হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করা এবং পিকআপ-জাহাজ-এরোপ্লেন ভর্তি করে সেসব খাদ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ও দেশের বাইরে পাঠানো। কিন্তু জাপানি কৃষি দার্শনিক মাসানবু ফুকুওকা তাঁর চিরায়ত গ্রন্থ One Straw Revolution-এ বলছেন, 'কৃষির চরম লক্ষ্য অধিকতর উৎপাদন নয়, মানুষের চরম বিকাশের জন্য এই কৃষিকে একটি সাধনা হিসেবে নিতে হবে।'

এই সাধনাই একসময় আমাদের দেশের কৃষকদের মূল লক্ষ্য ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৯৩০ সালের দিকেও আমাদের অঞ্চলে প্রায় ১৫ হাজার জাতের ধানের চাষাবাদ হওয়া।[৩] ধানের এই স্থানীয় জাতগুলো ছিল আমাদের কৃষকেরই সাধনার ফল এবং কয়েক হাজার বছরের প্রাকৃতিক সঞ্চয়। কিন্তু আমাদের আজকের কৃষিভূমিতে সেই সাধনার অনুপস্থিতি প্রবল। এখানে কৃষি যেন তার চরিত্র হারিয়ে নিছক এক যান্ত্রিক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষকের যাপনের জন্য যেন নিজস্ব কোন জীবন নেই। এ অঞ্চলের কৃষিজীবী সমাজের মধ্য থেকে হাজার হাজার বছর ধরে যে ধান-গান-কবিতা ও কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে, আজকের আধুনিক চাষাবাদের একটি মাঠে দাঁড়ালে তা খুব অসম্ভব বলে মনে হয়।

আজকে আমাদের মাঠের কৃষক নিঃস্ব। আধুনিক কৃষি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগনীতি, উচ্চফলনশীল জাত প্রচলন ইত্যাদি কারণে কৃষকের হাত থেকে তার বিপুল সম্পত্তি ও ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে গেছে। বছরের পর বছর ধরে উচ্চফলনশীল জাতের মাত্র কয়েকটি ধানের চাষ হওয়ায় সেই ১৫ হাজার জাতের ধানের প্রায় সবটাই আমরা হারাতে বসেছি। আমাদের সীমাহীন অবহেলা ও ক্ষমার অযোগ্য অসচেতনতার সুযোগে আমাদের মাঠ ও কৃষির সাধনা পুঁজির গোলামে পরিণত হয়েছে।

আমার পিতামহ ছিলেন কৃষক। অথচ তিন বছর আগ পর্যন্ত আমার কখনও মাঠে যাওয়ার সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়নি। ১০ বছর ধরে আমি একটি দেশিয় মোবাইল সফটওয়্যার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। আমার সহোদর বড় ভাই, তিনিও ১৪ বছর ধরে কম্পিউটার প্রকৌশলী হিসেবে একটি গার্মেন্টসে চাকরিরত। কিন্তু তিন বছর আগে, কোন এক অলৌকিক ক্ষমতা বলে, আমরা দুই ভাই একই সাথে অনুধাবন করেছিলাম যে আমাদের মাঠে ফেরা প্রয়োজন।

২০১৬ সালের মার্চ মাসে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়ায় আমাদের এক বন্ধুর প্রাকৃতিক খামার দেখতে আমি আর আমার বড় ভাই হাজির হই। আঁটি বাজার পার হওয়া মাত্রই একটা বুনো গন্ধ নাকে এসে লাগছিল। গ্রামের গন্ধ। রাস্তার দুপাশে ভাটফুল ফুটে ছিল। ভাবতে খুব ভাল আর অবাকই লাগছিল যে, ঢাকার এত কাছে এখনও প্রকৃতি এতখানি সজীব।

খামার ঘুরে দেখার পর দুপুরে খাওয়ার সময় আমরা এক বিস্ময়ের মুখোমুখি হই। আয়োজন ছিল খুব সামান্য। ভাত, লালশাক, ডাল আর ছোট মাছ। এর ভেতরে ভাত আর লালশাক ছিল বন্ধুর খামারেই উৎপন্ন। মুখে দিয়েই আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমার ভাইয়েরও। যেন কত সহস্র বছর পর খাবারের সেই স্বাদ পেলাম। ভেবেছিলাম, সেই জিহ্বা হারিয়ে গেছে। কিন্তু না, জিহ্বা হারায়নি, আসলে খাবারটাই হারিয়ে গিয়েছিল। তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমাদের মাঠে ফিরতে হবে।

সে সময় রাসায়নিক চাষাবাদ বা প্রাকৃতিক বা অর্গানিক বা নিরাপদ খাদ্যের চাষাবাদ–কোন কিছু সম্পর্কেই ধারণা ছিল না। এমনকি চাষ সম্পর্কেও কোন ধারণা ছিল না। সামান্য খাবার আমাদের প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমরা অনুভব করছিলাম, আমাদের মাঠ থেকে, জীবন থেকে কী অমূল্য সম্পদ হারিয়ে গেছে। এরপর আমরা যা কিছু ফলিয়েছি, তা থেকে আমাদের বন্ধুদের ভাগ দিয়েছি। যাঁরা তা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন, প্রত্যেকেই একই কথা বলেছেন যে খাওয়ার সময় তাঁদের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, খাবারের সাথে মানুষের ছোটবেলার সম্পর্কটা কী? এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে যা জানার সুযোগ হয়েছে তা খুব বিস্ময়কর আর উদ্বেগজনক। কারণ মাত্র ২০ বা ২৫ বছর আগে, আমার বা আমাদের বন্ধুদের ছেলেবেলায়, আমাদের মাঠগুলোতে যেভাবে ফসল উৎপাদিত হত, সেই পদ্ধতি

এখনকার মত এতটা যান্ত্রিক ছিল না। দূষণের মাত্রাও ছিল কম।

মূলত ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের পর থেকে আমাদের অঞ্চলগুলোতে রাসায়নিক কৃষি পদ্ধতিকে 'আধুনিক' কৃষি ব্যবস্থা হিসেবে প্রচলন করা এবং সংকট থেকে উত্তরণের 'একমাত্র' উপায় বলে প্রচার করা হয়ে আসছে। সেই প্রচারণার বিপুল ক্ষতির প্রতিক্রিয়াগুলো মাত্র ২০ বা ২৫ বছর আগে আমাদের মাঠে মাঠে সবেমাত্র প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সেই দূষণ থেকে ধারাবাহিকভাবে আজকের দূষণের বর্ধিত মাত্রাটাই আমাদের জিভগুলোতে কৃষিকাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে তো বটেই।

এর ফলে আমরা প্রথম দুই বছর কেরানীগঞ্জ উপজেলার কলাতিয়ায় ৪৬ শতাংশ জমি ভাড়া করে রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক, হার্বিসাইডমুক্ত চাষাবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করি। আমরা ভাবছিলাম মাসানবু ফুকুওকার কথা। তাঁর দর্শন আমাদের শেখাচ্ছিল, 'মানুষের জীবনকে কখনও খণ্ড খণ্ড করে দেখা যায় না। যখন আমরা খাদ্য উৎপাদনে চাষের প্রয়োগ নীতির পরিবর্তন করি, তখন আমাদের খাদ্যও পরিবর্তিত হয়ে যায়, সমাজে পরিবর্তন ঘটে। এবং আমাদের জীবনের মূল্যবোধেও পরিবর্তন ঘটে।'[৪]

তবে কি আজকের এই সমাজের দুঃখকষ্ট ও প্রকৃতির সীমাহীন ক্ষতি এবং সে সম্পর্কে আশ্চর্য উদাসীনতার মূলে রয়েছে আমাদের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা? তা কি আমাদের ভোগবাদী মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটায়? আর সে ব্যবস্থার পরিবর্তন করেই সমাজে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব? কথাটি খুব গুরুতর।

আমাদের দুই ভাইয়ের কৃষিকাজ শুরুর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ছোট পরিসরে নিজেদের খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটানো এবং একটি স্বাভাবিক মূল্যবোধ অর্জন। আমাদের কৃষিকাজের প্যাটার্নটি ছিল অভিনব। সপ্তাহে এক দিন। এটি ছিল আমাদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার। আমরা শুধু আমাদের ছুটির দিনগুলোই কৃষিকাজে ব্যয় করতে পারি। এতে তেমন কোন বিপ্লব সাধিত না হলেও আমাদের অগ্রজদের দেখানো পথ ও এর উপযোগিতা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে এই ধরনের কৃষিকাজে সব সময় ভাল ফল যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে অনেকটা সময়ও লেগে যায়। কিন্তু কাজটি এই সময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ বিবেচিত হওয়ায় আমরা এখনও পর্যন্ত হাল ছাড়িনি। এমনকি কৃষিকাজের তৃতীয় বছরের মাথায় আমরা আমাদের চাষের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য একই উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর পারে এমন একটি গ্রামে হাজির হই, যেখানে শতভাগ মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। এই প্রথম আমাদের সুযোগ হল সমগ্র দেশে প্রচলিত কৃষি পদ্ধতিকে আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার। তারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কৃষিক্ষেত্রে বিকল্প পথের দাবি আমাদের কাছে আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

আপনি জানলে অবাক হবেন যে ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আট বছরে বাংলাদেশের কৃষিজমিতে প্রায় ৪ লক্ষ ২২ হাজার মেট্রিক টন কীটনাশক স্প্রে করা হয়েছে।[৫] আমাদের বিশেষজ্ঞদের অধিক উৎপাদন তত্ত্ব, টাকার অঙ্কে লাভের হিসাবের বাইরে যে কোন প্রকৃতিসচেতন মানুষই কৃষিজমিতে এই বিপুল মাত্রার কীটনাশক প্রয়োগের খবরে আঁতকে উঠবেন। কারণ কৃষিজমিতে এই মাত্রার কীটনাশক প্রয়োগের ক্ষতি, যদি মানুষের বুদ্ধিতে কুলায়, তবে প্রকৃতিতে সামগ্রিকভাবেই তা অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত। কারণ একমাত্র এই অনুধাবনই সুস্থায়ী ও আমাদের উপযোগী চাষ পদ্ধতির দিকে আমাদেরকে ধাবিত করতে পারে।

কিন্তু এসব কোন নতুন কথা নয়। ১৯৮৫ সালে শিপমেই মুরাকা নামের একজন জাপানি চাষি বাংলাদেশের উপযোগী চাষের পদ্ধতি ও তার সম্ভাবনা নিয়ে এখানে বসেই দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে প্রশিকার কৃষি উপদেষ্টা পদে যোগদান করেন এবং প্রশিকার পরীক্ষামূলক প্রাকৃতিক কৃষি খামারে কাজ শুরু করেন। শিপমেই মুরাকা মাসানবু ফুকুওকার দর্শন দ্বারা খুবই অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি গভীর উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে জাপানের মত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কৃষিজমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং এ থেকে সৃষ্ট ভয়াবহ সমস্যাবলি প্রত্যক্ষ করতে জাপানিদের সময় লেগেছে প্রায় ৫০ বছর। অথচ বাংলাদেশের মত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ১০-১৫ বছরের মধ্যেই একই ধরনের সমস্যাবলি সৃষ্টি হয়েছে।[৬] বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এবং বন্যাপ্রবণ অঞ্চল হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ থেকে এই ক্ষতি ত্বরান্বিত হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষতির চেহারাটি কেমন?

১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে আমদানীকৃত নানা ধরনের কীটনাশক, ফাঙ্গিসাইড, হার্বিসাইডের পরিমাণ ছিল ৪১১৩ মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৭১৮৭ মেট্রিক টন।[৭] অবৈধভাবে আমদানীকৃত রাসায়নিক কীটনাশকের হিসাব বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সরকারি ডেটা থেকে পাওয়া হিসাব অনুযায়ী ১৯৯১ সালের তুলনায় আমাদের কৃষিভূমিগুলোতে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় ৮০৪ শতাংশ। এখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে মাত্র ২৫ বছরে আমাদের কৃষিভূমিতে এমন কোন ঘটনা ঘটল যে ফসল রক্ষা করার জন্য এই বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক কীটনাশকের আমদানি করতে হল? তবে কি এমন কোন কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন আমরা করেছি, যেখানে দিন দিন কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদের রোগ আর গাছের জন্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় বেড়েই চলেছে?

এই ঘটনা বুঝতে হলে আমাদের অরণ্য ও কৃষির বাস্তুব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। অরণ্য ও কৃষির তুলনামূলক ভাবনাটির জন্য শিপমেই মুরাকা প্রণীত 'প্রকৃতি থেকে শিক্ষা'র কাছে ঋণ স্বীকার করছি। একই ধরনের তুলনা মাসানবু ফুকুওয়ার লেখায়ও পাই।

প্রাকৃতিক অরণ্য ও কৃষি

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে প্রাকৃতিক অরণ্য ও কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা অভিন্ন। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে তার সবুজ পাতায় সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য বা বায়োমাস তৈরি করে। কিন্তু আমরা লক্ষ করলে দেখব যে অরণ্যের এই পদ্ধতিটি প্রাকৃতিক এবং কৃষির ক্ষেত্রে অনেকটাই কৃত্রিম। মজার বিষয় হচ্ছে, একটি অরণ্যের বায়োমাস উৎপাদনের পরিমাণ এত বিপুল যে তার তুলনায় কৃষির উৎপাদন অতি নগণ্য। আরও মজার বিষয় হচ্ছে, কৃষি থেকে উদ্ভূত সাধারণ সমস্যা, যেমন–মাটির উর্বরতা হ্রাস, ভূমিক্ষয়, রোগ বা পোকার আক্রমণ ইত্যাদির তুলনায় অরণ্যের ব্যবস্থাটি একেবারে নিখুঁত। আমরা কখনও দেখি না যে কোন পোকা বা কীট একটি অরণ্যকে খেয়ে উজাড় করে দিয়েছে। অথবা এমনও দেখি না যে উদ্ভিদের কোন একটি প্রাণসংহারী রোগের প্রাদুর্ভাবে হাজার হাজার একর বনভূমি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে আমরা সচরাচরই তা

দেখতে পাই। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, একটি অরণ্য প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যে অনন্য জীববৈচিত্র্য গড়ে তুলতে পারে, তা সত্যিই তুলনাহীন। এক একর বনভূমিতে প্রায় ১০০ প্রজাতির উদ্ভিদ থাকে। কিন্তু এক একর কৃষিভূমিতে সাধারণত একটি প্রজাতির ফসলই দেখা যায়। কৃষির এই বৈচিত্র্যহীন একক ফসলের চাষ (monoculture) কৃষিভূমিতে ব্যাপক ভারসাম্যহীনতা ও সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

উদাহরণ হিসেবে আমাদের টমেটো চাষের কথা উল্লেখ করা যায়। কেরানীগঞ্জে চাষাবাদ শুরুর প্রথম বছরে আমরা আমাদের একটিও টমেটো গাছ বাঁচাতে পারিনি। দিব্যি তরতাজা যুবক গাছগুলো থেকে আমরা যখন আমাদের প্রয়োজনীয় টমেটোর ভবিষ্যৎ ফলনের কথা ভেবে উত্তেজনা বোধ করছিলাম, সে সময়ই একদিন সাদা মাছির (silverleaf whitefly) আক্রমণের শিকার হয় গাছগুলো। এই পোকার মুখের রস থেকে এক ধরনের ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে, যেটি গাছগুলোকে আর বাঁচতে দেয়নি। প্রচলিত পদ্ধতিতে কৃষক এই সমস্যা থেকে বাঁচতে তার ফসলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড– জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করে থাকে। আমরা এই পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান খুঁজিনি। বিকল্প পথ হিসেবে দ্বিতীয় বছরে আমরা আমাদের টমেটো গাছ ঘিরে ভুট্টা ও হলুদ গাঁদা ফুলের গাছ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। টমেটোর তুলনায় সাদা মাছির ভুট্টা এবং গাঁদা ফুল অধিক পছন্দ। আর এর মুখের লালায় থাকা ছত্রাকটি উল্লিখিত গাছগুলোর ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। ফলে চাষ পদ্ধতিতে সামান্য বৈচিত্র্য এনে দ্বিতীয় বছরে আমরা আমাদের টমেটো ক্ষেত থেকে প্রচুর পরিমাণ ফসল সংগ্রহ করতে পারি। প্রকৃতিতে থাকা একটি জীবের কোন ধরনের ক্ষতিসাধন না করেই এটি সম্ভব হয়।

প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বৃক্ষ, কীটপতঙ্গ, পাখি ও অন্যান্য জীবের মধ্যে বিপুল বৈচিত্র্য এবং আরও নিখুঁত খাদ্যশৃঙ্খলের ফলে কীটপতঙ্গ সব সময়ই একটি সীমার মধ্যে থাকে। যদিও বা কোন রোগ বা পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, তাতে একটি বা দুটি প্রজাতির উদ্ভিদের ক্ষতি হওয়া ব্যতীত সমগ্র বনাঞ্চল কখনও ধ্বংস হয়ে যায় না।

মাটির উর্বরতা প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও কৃষিক্ষেত–উভয়ের জন্যই জরুরি। কিন্তু আমরা কখনও দেখি না মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কখনও কোন বনাঞ্চলে কাউকে ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি, এমওপি প্রভৃতি সার ছড়াতে। তথাপি আমাদের কৃষিক্ষেতগুলোর চেয়ে একটি প্রাকৃতিক বনভূমি কয়েক লক্ষ গুণ উর্বর। সেই তুলনায় আমাদের কৃষিজমিগুলো প্রতিনিয়ত তার উর্বরতা হারাচ্ছে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশের আবাদি জমিগুলোতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হত হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৬০ কেজি। ২০১৬ সালে এই প্রয়োগের মাত্রা দাঁড়ায় হেক্টরপ্রতি প্রায় ২৯০ কেজিতে।[৮]

অথচ আমরা লক্ষ করেছি যে একটি জমিতে চাষ না করে ফেলে রাখলেও তার উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখনই কৃষিকাজ করা হচ্ছে, তখনই তার উর্বরতা দিন দিন কমে আসছে। তাই এই পর্যায়ে আমাদের আরও একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন করতে হবে, তা হচ্ছে– আমরা কি এমন কোন কৃষি পদ্ধতির প্রচলন করেছি, যা জমিকে প্রাকৃতিকভাবে উর্বর হওয়ার কোন সুযোগই দেয় না। এমনকি মাটি তার নিজস্ব উর্বরতা ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে?

প্রশ্নটা মাথায় ঘুরতে থাকুক। এই সুযোগে আমাদেরকে প্রাকৃতিক পুষ্টিচক্রের দিকে একটু নজর বুলিয়ে নিতে হবে। পরিবেশবিদ্যায় সকল জীবই উৎপাদনকারী, ভোগকারী ও পচনকারী– এই তিন শ্রেণির কোন না কোনটির অন্তর্ভুক্ত। জড় বস্তুর সাথে এই তিনটি শ্রেণির আন্তক্রিয়া সম্পর্কিত ধারণাই পরিবেশ পদ্ধতি অনুধাবনের মূল বিষয়। এর ভেতরে পাতায় সবুজ রং আছে এমন উদ্ভিদই হচ্ছে উৎপাদনকারী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কারণ জীবকুলের মধ্যে একমাত্র উদ্ভিদই খাদ্য উৎপাদন করে। ভোগকারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের খাদ্যের (শ্বেতসার) জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। এই ভোগকারীদের আবার চারটি শ্রেণি বিদ্যমান। প্রথম শ্রেণি (তৃণভোজী), দ্বিতীয় শ্রেণি (পতঙ্গভুক), তৃতীয় শ্রেণি (শিকারি জীবজন্তু) এবং চতুর্থ শ্রেণির ভোগকারীদের মধ্যে আছে মাংসাশী প্রাণী। আমরা প্রকৃতিতে দেখেছি, এই সকল প্রাণীর মধ্যে একটি সুষম সম্পর্ক বিদ্যমান। এরা খাদ্যের জন্য যেমন একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি একটি শ্রেণির হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য অন্য একটি শ্রেণির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। যেমন–বিদেশে রফতানির জন্য প্রচুর পরিমাণ ব্যাঙ (দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত) হত্যা করা হলে ফসলের জমিতে কীটপতঙ্গের (প্রথম শ্রেণিভুক্ত) প্রাদুর্ভাব বেড়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। আবার যদি ফসলের পোকামাকড় বৃদ্ধি পায়, তাহলে জমিতে ব্যাঙ বা মাকড়সা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক শিকারি প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

সকল প্রকার অণুজীবই পচনকারীদের দলভুক্ত। তারা উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মৃতদেহ, বর্জ্য ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। মাটিতে প্রচুর পরিমাণ অণুজীব থাকে। এক গ্রাম উর্বর মাটিতে প্রায় ১০ কোটি অণুজীবের অস্তিত্ব থাকে।[৯] অণুজীবের কাজ হচ্ছে মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ ভেঙে হিউমাসে রূপান্তর করা এবং খনিজ পদার্থের মিনারালাইজেশন ঘটানো। মাটি তৈরি ও মাটিতে পুষ্টি ফিরিয়ে দিতে হিউমাস অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখার মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে। প্রকৃতিতে এই তিনটি শ্রেণি একে অপরের ওপর এই পুষ্টিচক্রের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল। এই চক্র অনুযায়ী যত বেশি পরিমাণ উদ্ভিদ হবে, তত বেশি পরিমাণ বিভিন্ন শ্রেণির ভোগকারী সৃষ্টি হবে; আবার উদ্ভিদ ও ভোগকারীর বর্জ্য যত বেশি হবে, অণুজীবের পরিমাণ তত বাড়বে এবং মাটি ও গাছের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিও বৃদ্ধি পাবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি প্রাকৃতিক বন প্রতিনিয়ত উর্বর হতে থাকে এবং বনের পরিসর বাড়তে থাকে।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাসায়নিক কৃষির ক্ষেত্রে ২০০৩ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে মাত্র ১৩ বছরের মধ্যে হেক্টরপ্রতি জমিতে ১৩০ কেজি বেশি রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হচ্ছে। কৃষিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ মাটিতে থাকা অণুজীবের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। ফলে মাটিকে উর্বর করতে প্রকৃতির নিজস্ব ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এই ধরনের ফসল উৎপাদন পদ্ধতিকে আমরা কৃত্রিম পদ্ধতি বলতে পারি, যেখানে আমাদের ফসলের ভূমিগুলো প্রকৃত অর্থে চকোলেট ফ্যাক্টরির ছাঁচের মত এবং কৃষককে ফ্যাক্টরির শ্রমিকের মত ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে উচ্চফলনশীল বীজ, বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক সার ও নির্বিচার কীটনাশক, হার্বিসাইড, ফাঙ্গিসাইড, রাসায়নিক হরমোন প্রভৃতি প্রয়োগ করে অস্বাভাবিক কম সময়ের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ফসল ফলানো হচ্ছে (বোঝার সুবিধার্থে ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন ব্যবস্থা স্মরণ করতে পারি)। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন একটা বাঁধাকপিকে আমরা মন চাইলে বাঁধাকপি বা বেগুনকে চাইলে বেগুন বলে ডাকতে পারি। কিন্তু তা মূলত এই প্রয়োগকৃত রাসায়নিক উপাদানেরই একটি ছদ্মবেশ মাত্র।

আমরা যখন ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলোতে চাষাবাদের জন্য জমি খুঁজছিলাম, তখন আমাদের সাথে ছিল একটি pH মিটার। এই মিটারের সাহায্যে মাটিতে বিদ্যমান এসিড বা ক্ষারের পরিমাণ নির্ণয়

করা যায়। এই মিটারে সাধারণত ৮ পর্যন্ত পরিমাপক থাকে, যেখানে ৭ একটি নিউট্রাল পজিশন এবং এর যত নিচের দিকে যাবে, তত মাটিতে বিদ্যমান এসিডিটির মাত্রা প্রকাশ করবে। ৪ এবং এর নিচের যে কোন মাত্রার মাটিতে এসিডের পরিমাণ এত বেশি যে উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব নয়। ধলেশ্বরীর তীরবর্তী চরে আমরা প্রায় অধিকাংশ জমিতেই এই এসিডিটির মাত্রা পেয়েছি ৪.৫। তবে কি প্রচলিত কৃষি পদ্ধতি বাংলাদেশকে মরুকরণের দিকে ধাবিত করছে?

এই লেখাটি শুরু করার আগে আমি খামারবাড়িস্থ এদেশের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে হাজির হই। আমার কৌতূহল ছিল, কয়েক দশক ধরে এদেশের কৃষিভূমিতে যে পরিমাণ রাসায়নিক সার, কীটনাশক, হার্বিসাউড ও ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে মাটির ঠিক কতটা ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার। প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আমাকে জানান যে এই ক্ষতির পরিমাণ গবেষণা করা আসলে খুবই প্রয়োজন। তবে এই ধরনের গবেষণার জন্য যে গবেষণাগার ও জনবল প্রয়োজন, তার সুযোগ এদেশের সরকার সৃষ্টি করতে পারেনি।

যখন দেশজুড়ে হাজার কোটি টাকার 'উন্নয়ন' প্রকল্প চালু রয়েছে এবং প্রতিদিনই নিত্যনতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, সেই সময়ে এই ধরনের দায়িত্বশীল বক্তব্য পাওয়া গেলে প্রশ্ন জাগে, এত উন্নয়ন তাহলে কিসের জন্য?

যেহেতু সরকারি পর্যায়ে এই সকল গুরুতর বিষয়ে ততোধিক গুরুতর অবহেলা রয়েছে, আমাদের উচিত যতটুকু ডেটা পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে একটি মোটামুটি ধরনের চিত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করা।

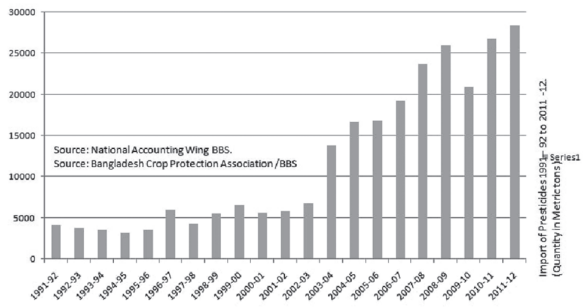

এই চিত্রটিতে ১৯৯১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এদেশের কৃষিভূমিতে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগের প্রবণতার ধরন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বছরের পর বছর এটি প্রয়োগের মাত্রা বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ আমরা এতদিন ধরে যাকে চাষাবাদের 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' হিসেবে মাথায় করে নেচেছি, তা আমাদের প্রকৃত উন্নয়নের পথে কত বড় বাধা, তারই যেন পরিষ্কার চিত্র এটি।

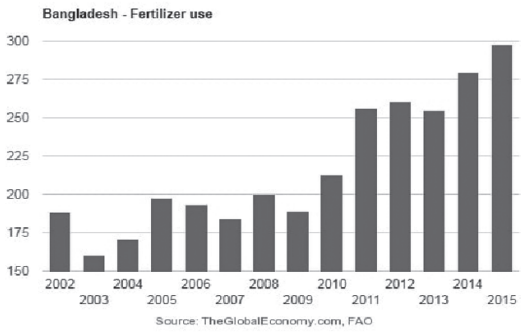

আবার ২০০২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি হেক্টর কৃষিভূমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের যে ডেটাটি আমি জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (এফএও) থেকে সংগ্রহ করেছি, সেটির চেহারা দেখলেও একই ধরনের ধারণা প্রকট হয়। আমাদের অবশ্যই এই পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ ও প্রশ্ন করতে হবে।

ধলেশ্বরীতীরের অনেক কৃষক বর্তমানে আমাদের সহকর্মী। সে কারণে প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত মানুষদের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জানার সুযোগ হয়েছে যে এই চিত্রগুলো কোন কাল্পনিক চিত্র নয়। বরং আজকের ধলেশ্বরী তীর তথা সমগ্র বাংলাদেশের কৃষক জানে যে এ বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ফসল উৎপাদন করতে তার যে পরিমাণ রাসায়নিক সার ও কীটশাটক বা হার্বিসাইড বা ফাঙ্গিসাইডের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়েছে, আগামী বছর একই পরিমাণ জমি থেকে একই পরিমাণ ফসল সংগ্রহ করতে তাকে এই সমস্ত রাসায়নিক ব্যবহারের মাত্রা দেড় থেকে দুই গুণ, ক্ষেত্রবিশেষ এর চেয়েও বেশি বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতিবছর রাসায়নিক সারের চাহিদা তৈরি হয় প্রায় ৫০ লক্ষ টন। এর ভেতরে ইউরিয়া ও অন্যান্য সার মিলিয়ে বাংলাদেশি সার কারখানাগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ১০ লক্ষ টনের কাছাকাছি।[১০] বাকিটা আমাদের আমদানি করতে হয়। চাহিদাকৃত এই রাসায়নিক সারের বাজারমূল্য প্রায় ৯৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই টাকাটা শুধু সারের পেছনে আমাদের কৃষকদের প্রতিবছরের ব্যয়। একটু ভাবা দরকার যে কার টাকা কোন পথে কোথায় চলে গেল।

ধলেশ্বরী নদীতীরের একজন কৃষক যখন কৃষিতে তার লাভ-ক্ষতির হিসাবে বসে, সে সময় নিজের জমি ও পরিবারের সকলের পরিশ্রমের মূল্য সে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। কিন্তু যদি সেই শ্রমের বাজারমূল্যকে ধরা হয়, তাহলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাতলে দেয়া পথে কেমন দাঁড়ায় ধান উৎপাদনের হিসাব?

সেই হিসাবটা এখানে করা যাক। ধলেশ্বরীর তীরবর্তী অঞ্চলে জমিজমার হিসাবে যে একক ব্যবহার করা হয়, তার নাম 'পাকি'। এক পাকি=২৬ শতাংশ। ধরা যাক, এক পাকি জায়গায় একজন কৃষক রোপা আউশের চাষ করবে। উচ্চফলনশীল চারা লাগালে যদি পোকামাকড়ের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব বা বাস্টের মত মড়ক না লাগে, তাহলে ২৬ শতাংশ জায়গা থেকে সর্বোচ্চ ধান উৎপাদন হবে ১৪ মণ। এই ১৪ মণ ধান উৎপাদনের খরচটা একবার দেখে নিই।

বিষয়	পরিমাণ	টাকা
জমি লিজ	চার মাস	২৩৩৩
ধানের চারা		১২০০
জমি চাষ	৩ বার × ৩০০ টাকা	৯০০
ধান লাগানো		১৮০০
ইউরিয়া সার	৫০ কেজি × ১৬ টাকা	৮০০
টিএসপি সার	৪০ কেজি × ২২ টাকা	৮৮০
ডিএপি	২০ কেজি × ২৭ টাকা	৫৪০
এমওপি সার	২০ কেজি × ১৫ টাকা	৩০০
নিড়ানো	২ জন শ্রমিক × ৩ বার × ৪০০ টাকা	২৪০০
সেচ		২০০০
কীটনাশক		১০০০
ধান কর্তন	৩ জন শ্রমিক × ২ দিন × ৪০০ টাকা	২৪০০
মাড়াই	৩ জন শ্রমিক × ১ দিন × ৪০০ টাকা	১২০০
রোদে শুকানো	৩ জন শ্রমিক × ২ দিন × ৪০০ টাকা	২৪০০
বস্তা	১২টি × ১০ টাকা	১২০
পরিবহন খরচ	১২ বস্তা × ৫০	৬০০
	সর্বমোট	১৯,৬৭৩

প্রতি মণ ধানের উৎপাদন খরচ ১৪০৫.২৫ টাকা, সর্বোচ্চ বাজারমূল্য ৮০০.০০ টাকা, ক্ষতি* ৬০৫.২৫ টাকা

*এই ক্ষতি শুধুমাত্র টাকার মূল্যে। ভূগর্ভ থেকে পানি উত্তোলন, জমিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রয়োগে জমি, পার্শ্ববর্তী নদীর দূষণ, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট ও মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতির দিকগুলো বিবেচনা করলে এই উৎপাদন পদ্ধতিতে ক্ষতির পরিমাণ খুব বড় আকারে দেখা যাবে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, দেশের উৎপাদন নিয়ে বিভিন্ন দিকে উল্লাস দেখা গেলেও এই উৎপাদন ব্যবস্থা আসলে কৃষককে ভর্তুকি দিয়ে নয়, কৃষকের কাছ থেকে ভর্তুকি নিয়ে টিকে আছে। তবে কৃষকের ক্ষতি কমানোর জন্য পুঁজির যে পদ্ধতি, তা আবার আরেক তীব্র সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

ওপরের খরচের হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে ২৬ শতাংশ জায়গায় ধান উৎপাদন করতে ৩ বার 'আগাছা' নিড়াতে হয়। তাতে প্রায় ২৪০০ টাকা খরচ হয়। কিন্তু যদি ১৫০ টাকা দামের একটি ওষুধ স্প্রে করে 'আগাছা' দমন করা যায় তো সেই সুবিধা কৃষক কেন গ্রহণ করবে না? ফলে বাংলাদেশে কৃষিভূমিগুলোতে আগাছানাশক বা হার্বিসাইডের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এই হার্বিসাইডের একটি হচ্ছে মনসান্টোর রাউন্ডআপ। রাউন্ডআপ তৈরির প্রধান উপাদান হচ্ছে 'গাইফোসেট'। এই উপাদানটি ক্যান্সারের জন্য দায়ী হিসেবে প্রমাণ পাওয়ায় গত বছর আগস্টে মার্কিন আদালত মনসান্টোকে ২৮ কোটি ৯০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়। পরে এই জরিমানার পরিমাণ কমানো হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে গাইফোসেটযুক্ত রাউন্ডআপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে রাশিয়া, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন ও ভিয়েতনামের মত দেশগুলোতে।[১১] কিন্তু বাংলাদেশে রাউন্ডআপ নিষিদ্ধ নয়। তবে শুধু রাউন্ডআপই নয়, বাংলাদেশে অনুমোদিত আগাছানাশকের মধ্যে গাইফোসেটযুক্ত আরও ৬৮টি আগাছানাশকের জনপ্রিয়তা রয়েছে।[১২] ধলেশ্বরী তীরের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী মোজ্জাম্মেল ভাই বলেন, 'যেমন চান তেমন আগাছনাশক আছে। সিলেক্টিভ, ননসিলেক্টিভ...কোন কোনটার শক্তি এত বেশি যে মাটি পুড়ায়ে দেবে।' এই ভদ্রলোক কিন্তু রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়া চাষ করা আমাদের ফসলের বিশেষ ভক্ত।

কিন্তু এত কিছু করেও কৃষকের শেষরক্ষা হচ্ছে কি? প্রায়ই ঋণের দায়ে কৃষকের আত্মহত্যার খবর শুনতে পাই। সর্বশেষ খবর এল এ বছরেরই মার্চ মাসের শেষ দিকে নওগাঁ থেকে। এখানে কৃষক শুধু নিজেই আত্মহত্যা করেননি, দইয়ের ভেতরে বিষ মিশিয়ে স্ত্রী ও সন্তানকেও হত্যা করেছেন।[১৩] একই কারণে দিনাজপুর ও লালমনিরহাট থেকেও কৃষকের আত্মহত্যার খবর এসছে। ফলে এগুলোকে নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আমাদের উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে যে কেন কৃষকের এই কষ্ট– যেখানে একটা ধানের দানা পুঁতলে কয়েক হাজার ধান পাওয়া যায়, একটা ডালবীজ জমিতে ছড়িয়ে দিলে কয়েক শ ডালবীজ ঘরে আসে। এত কিছুর পরেও কেন সমৃদ্ধি আসে না, সুখ ধরা দেয় না?

আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে ধলেশ্বরীর তীরবর্তী গ্রামগুলোতে কৃষকরা বছরে দুটি ফসল করত। বীজমন্ত্র তাদের হাতে ছিল। জমি এতটা উর্বর ছিল যে রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের কোন প্রয়োজন ছিল না। পলিযুক্ত মাটি যেন তাদের প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ করে গেছে। আর সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করে জীবনকে যাপন করার যথেষ্ট সময় তার হাতে ছিল।

শহরের করপোরেশনগুলোতে একজন চাকুরে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করেন। কিন্তু আজকের নতুন প্রজন্মের কৃষক বেশি উৎপাদনের যে ফাঁদে পড়েছে, সেই ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় সে সপ্তাহে ১১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে। সে ভাবে, এভাবে সে ঋণমুক্ত হতে পারবে, পারিবারকে ভাল রাখতে পারবে, সমৃদ্ধি আনতে পারবে। কিন্তু কৃষক জানে না, তার অগোচরেই তার ভূমি, শ্রম, স্বপ্ন লুট হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সেই হারানো স্বপ্ন খুঁজে ফেরার প্রচেষ্টা থেমে থাকে না। পরবর্তী প্রজন্ম বড় হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি, সেই প্রজন্ম আর মাঠে ফিরতে চায় না। এই গ্রামগুলোর সর্বশেষ প্রজন্মের তাই ৬০ শতাংশের কাছাকাছি মানুষ প্রবাসী শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

মাসানবু ফুকুওকা খুব জোর গলায় বলে গেছেন, বাণিজ্যিক কৃষি ব্যর্থ হবেই। লাভকে সামনে রেখে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন মানুষের জন্য কখনওই কল্যাণকর হবে না। সেই সংকটের চেহারা এখন আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থায়, মাঠে, জীবনে প্রকটভাবেই অনুভব করা সম্ভব। কিন্তু বিকল্প পথ যে নেই, তেমনটা ভাবারও কারণ নেই। ১৯৩০ সালের পর থেকেই দেশে দেশে সুস্থায়ী কৃষি বা প্রাকৃতিক কৃষি নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা হয়েছে। আজকে একথা বলার আর কোন সুযোগ নেই যে রাসায়নিক কৃষি ছাড়া, বাণিজ্যিক কৃষি ছাড়া এত মানুষের খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। ফুকুওকাই দেখিয়ে গেছেন, প্রকৃতির কোন ক্ষতিসাধন না করেই 'আধুনিক কৃষি'র চেয়ে অধিক খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব। প্রকৃতির সকল কিছুই মানুষ জানে, এমন ভুল অহংকার থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির সাথে আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধকে দূর করা প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল মানুষকে এই প্রকৃতিই খাওয়াতে পারে। মানুষকে শুধু ভাবতে শিখতে হবে, এই 'পৃথিবীটা পাখি গাছ মানুষ–সবার।'

মেহেদী হাসান সুমন : আইসিটি গবেষক, পরিবেশ কর্মী
ইমেইল : sumon@mcc.com.bd

তথ্যসূত্র

১। https://www.banglanews24.com/national/news/bd/305241.details

২। www.ais.gov.bd; wjsK: https://urlzs.com/2v9M

৩। http://ubinig.org/index.php/nayakrishidetails/showAerticle/11/25/bangla

৪। WENDELL BERRY; *One Straw Revolution,* Page-7

৫। http://bonikbarta.net/bangla/print.php?id=163481&&date=2018-07-07

৬। *প্রকৃতি থেকে শিক্ষা*, শিমপেই মুরাকামি, পৃষ্ঠা ১০

৭। *কৃষি বর্ষ গ্রন্থ*-২০১৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান অধিদপ্তর, পৃষ্ঠা ৪০৪

৮। https://knoema.com/atlas/Bangladesh/Fertilizer-consumption

৯। শিমপেই মুরাকামি, *প্রকৃতি থেকে শিক্ষা*, পৃষ্ঠা ১৪

১০। *Fertilizer Industrz of Bangladesh;* Department of Research Emerging Credit Rating Limited; May-2017, Vol-1, Page-2; লিংক: https://urlzs.com/9d43

১১। আগাছানাশক : ক্যান্সারের ঝুঁকি, তবু বাজারে মনসান্টোর রাউন্ডআপ, বণিক বার্তা, ৩১ মার্চ ২০১৯, লিংক : https://urlzs.com/gSaE

১২। Registered Pesticides List; Bangladesh Crop Protection Association
লিংক: http://www.bcpabd.com/list-of-pesticide.php

১৩. ঋণের দায়ে স্ত্রী-সন্তানকে বিষপানে হত্যার পর কৃষকের আত্মহত্যা, সমকাল, ৩০ মার্চ ২০১৯, লিংক : https://urlzs.com/kksq